দৈনিক সংবাদ
১৮ FEB 1988

প্রাথমিক শিক্ষা

সৈয়দ আলী কবীর

গ্রামেগঞ্জে তেরো-চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়ে দেখেছেন। তাদের কোনদিন স্কুলে যাওয়া হয়নি। তারা নিরক্ষর থেকে গিয়েছে। তারা রোজগার করতে লেগে গিয়েছে। লাংগল টানছে বা গরু চরাচ্ছে। কিছু না কিছু করছে। মেয়ে হলে অনেকের বিয়ে হয়ে গিয়েছে, বিয়ের বয়স সংক্রান্ত আইন ভংগ করে। আইনতঃ আমাদের দেশের ষোল বছরের নীচের কোন মেয়ের বিয়ে হতে পারে না। শহরে-নগরেও তের চৌদ্দ বছরের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে ভাগ্যহীন। কাজকর্মে লেগে গিয়েছে। ছেলেরা মোট বইছে। রিক্সাও টানে। টেম্পোতে কণ্ডাক্টারগিরি করে। অনেক ছেলে কারো বাড়ীতে কাজ করে। মেয়েরা সুযোগ পেলে ঝিগিরি করে। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে তারা। কিছুদিন পূর্বে ঢাকা রেল ষ্টেশনে গিয়েছিলাম। রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্ত বিলম্বিত তিস্তা এক্সপ্রেসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সাত-আটজন আট-নয় বছরের গরীব শিশু প্ল্যাটফর্মে খেলে বেড়াচ্ছে। স্বাভাবিক জীবনে তাদের না রাতের বেলায় নিরুপদ্রব বিছানায় শুয়ে থাকবার কথা? পরের দিন স্কুল যাবে। কিন্তু সে ভাগ্য তাদের নাই। তারা কোনদিন স্কুলে যায়নি আর যাবেও না। নতুন ঢাকার ট্রাফিক লাইটের নিকট আমরা দেখি যে, কচি কচি ছেলেমেয়েরা ফুল বিক্রি করতে চায়, গাড়ীওয়ালা মানুষের কাছে তারা কোনদিন স্কুলে যাবার সুযোগ পায়নি।

যাদের কথা বললাম দেশ তাদের প্রতি প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছে। তাই তারা আজও নিরক্ষর। ১৯৭৪ সালের শিক্ষা সংক্রান্ত কুদরতে খুদা কমিশন রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, দেশে ১৯৮০ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক ভাবে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে। সূচনার পর পাঁচ

কথার কথা ভেবেছিলো। কারণ তার কমে মানুষের ন্যূনতম শিক্ষার প্রয়োজন মেটানো যায় না। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে পাঁচ বছরের শিক্ষার কথা বলা হয়েছিলো।

১৯৮০ সালে যাদের পাঁচ বছর বয়স হয়েছিলো আজ তাদের তেরো বছর বয়স হয়ে গিয়েছে। কিন্তু জাতির প্রতিশ্রুতি ভংগ করার দরুন তাদের শিক্ষা পাবার সুযোগ হয়নি। যদি তাদের প্রতি আমরা কথা রাখতাম তাহলে তের বছরের অনূর্ধ্ব কোন ছেলে আজ নিরক্ষর থাকতো না। অথচ সম্ভবতঃ ওই বয়সে ষাট-সত্তর শতাংশ বা তারও বেশী ছেলেমেয়ে আজও নিরক্ষর।

যে সরকার সার্বজনীন শিক্ষা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, তারা ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট বিলুপ্ত হয়েছে। সত্যি কথা যে, ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে আমাদের ১৯৭২ সালের শাসনতন্ত্রের খোলনলচে বদলে বাকশালের মধ্য দিয়ে দেশে দ্বিতীয় বিপ্লব আনার কথা বলা হয়েছিলো। তবে সার্বজনীন শিক্ষা সেই দ্বিতীয় বিপ্লবের বাইরে থাকতে পারতো না। যদিও চতুর্থ সংশোধনী মস্ত বড় ভুল মানুষের সরকারের প্রতি বিশ্বাসকে নড়বড়ে করে দিয়েছিলো, তবুও সার্বজনীন শিক্ষা সম্বন্ধে ১৯৭৪ সালে যে প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছিলো তা যে তারা ভাংতো তা ধরে নেওয়া যায় না।

কুদরতে খুদা কমিশন রিপোর্ট শিক্ষা সম্বন্ধে অত্যন্ত মূল্যবান দলিল ছিলো। তাদের মত ছিল যে, প্রাথমিক শিক্ষা দেশের মাতৃভাষায় দেওয়া হবে।

চুষী আকাঙ্ক্ষা। তারা চায় তাদের ছেলেমেয়েরা বাংলার মতো বরঞ্চ তার চাইতে ভালো করে ইংরেজী শিখুক। শিখলে বিদেশে গিয়ে পড়ালেখা করতে পারে। কত কিছু হতে না পারবে। কিন্তু দেশের অগণিত ছেলেমেয়ে দেশেই থাকবে। তারা মাঠেও কলকারখানায় কাজকর্ম করবে। বাংলার মাধ্যমে পড়ালে তাদের শিক্ষার গুণগত মান বাড়বে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচ বছরের মধ্যে তারা বাংলা ভাষা রপ্ত করবে। উপরন্ত প্রয়োজনীয় অংক শিখবে। সার্বজনীন শিক্ষা যখন সূচনার পর আট বছর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করার কথা তখন তারা কিছু ইংরেজীও শিখবে। কিন্তু প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা ইংরেজী নয় তেমন কোন দেশ ইংরেজী শেখাবার কথা ভাবে না। ব্যতিক্রম যারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন ছিলো কিন্তু অ-ইংরেজ ইউরোপীয় দেশ বা এশিয়ার জাপান, কোরিয়া, চীন প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী শেখায় না। তারা ইংরেজী বা কোন বিদেশী ভাষা শেখায় মাধ্যমিক স্তরে।

কুদরতে খুদা কমিশন রিপোর্ট ব্যবহারিক শিক্ষার ওপরেও জোর দিয়েছিলো। বাস্তব জীবনের পরিবেশ, সমাজের চাহিদা, ছাত্রদের মানসিক ক্ষমতা ও দৈহিক ক্ষমতা এবং অভিরুচির সংগে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজনের কথা কমিশন উপলব্ধি করেছিলো। কমিশনের লক্ষ্য ছিলো যে, শিক্ষা কর্মমুখী ও ব্যবহারিক হবে। যেহেতু দরিদ্র দেশে ছেলেমেয়েরা এক পর্যায়ে কাজ-

খাবার দেয়া হয়। ভারতের তামিলনাড়ুতে এই ব্যবস্থা আছে বলে জানি।

এখানে একটা কথা আলোচনা করা প্রয়োজন। একটা স্তর পর্যন্ত সার্বজনীন শিক্ষার সূচনা আরম্ভ হয়েছিলো বুর্জোয়া বিপ্লবের পর। সামন্ততন্ত্র বিষয়টাকে আমল দেয়নি। উপরন্ত ছাপাখানার আগমনের পূর্বে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার সম্ভব ছিলো না। মধ্যযুগে অভিজাত শ্রেণীর অনেকেই পড়ালেখা জানতো না। অভিজাত মহিলারা সাধারণতঃ নিরক্ষর হতো।

বুর্জোয়া বিপ্লব যখন দেশে শিল্পায়ন আনলো, তখন সার্বজনীন শিক্ষা একটা স্তর পর্যন্ত আবশ্যকীয় হয়ে গেলো। নইলে কলকারখানা দক্ষতার সংগে চালানো যাবে না। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশ আর এক কারণে মানুষকে শিক্ষিত করার প্রয়োজনবোধ করলো। যতই ভোটের প্রসার হতে লাগলো ততই দেশের নাগরিককে শিক্ষাদানের প্রয়োজন বোধ হলো, যাতে তারা যথার্থভাবে ভোট প্রয়োগ করতে পারে। গণতান্ত্রিক দেশ শিক্ষাকে মানবাধিকারের মর্যাদা দিলো। সুতরাং সব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে ভোটের অধিকার দেয়াই যথেষ্ট নয়; তার নিরক্ষরতাকে দূর করা প্রয়োজন। কারণ তাহলেই সে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লিখিত বক্তব্যকে উপলব্ধি করতে পারবে। দেশের সমস্যা সম্বন্ধে কাগজপত্র পড়ে ধ্যানধারণা করতে পারবে।

বুর্জোয়া বিপ্লব এসেছে, এমন দেশও ছিলো যারা আধা-গণতান্ত্রিক, যেমন জার্মান ও জাপান। ইটালীতে মসোলিনী

বাদ দিতে পারেনি। নইলে বুর্জোয়া সমাজ অচল হয়ে পড়বে। যেকোন ডিক্টেটর বা উগ্র-জাতীয়তাবাদী দেশ অবশ্য শিক্ষাকে বিকৃত করতে দ্বিধান্বিত হয়নি। কিন্তু সার্বজনীন শিক্ষাকে বাদ দেবার কথা ভাবতে পারেনি। অন্যথায় দেশের অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণ ব্যর্থ হবে।

সমাজতান্ত্রিক দেশ শিক্ষাকে মানবাধিকারের পর্যায়ে ফেললো। যে সব দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটেছে তার সব নাগরিকের বেলায় এক পর্যায় পর্যন্ত সার্বজনীন শিক্ষা দ্রুত প্রসার লাভ করলো। নইলে মানুষের পূর্ণ বিকাশ হয় না।

১৯৭৫ সালের আগষ্টের পরে কথা দেয়া হয়েছে যে, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটানো হবে। কখন ও কবে তাকে বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন করা হবে সে কথা বলা হয়নি। তবে বলা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো হবে। তবে ইদানীং বলা হচ্ছে যে, ১৯৯০ সালের মধ্যে দেশের সত্তর ভাগ প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা হবে। দেখা যাক ফলাফল কি হয়।

আমাদের দেশে চল্লিশ হাজারের ওপর প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। সেগুলো চলে না। তাদের ঠিক মত চালালে এই লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব নয়।

দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাকে জটিল করে ফেলা হয়েছে। ছাত্রদের শুরু থেকে ইংরাজী শিখতে হবে। তবে এখন শুনছি যে, তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরাজী পড়ানো হবে শিক্ষকের অভাবের দরুন। এটাও অপ্রয়োজনীয় ও অবাস্তব পদক্ষেপ। উপরন্ত ছাত্রদের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগাবার জন্য গোড়া থেকে মুসলমান ছাত্রদের দীনিয়াত শিক্ষা দেয়া হবে। এই পদক্ষেপও অবাস্তব। ছাত্রদের মধ্যে

ধর্মীয় শিক্ষা নিজের পরিবারের কাছে নিতে পারে, যেমন তারা নিয়ে এসেছে। প্রাথমিক স্তরে স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করলে শিশুদের ওপর ভার বেড়ে যায়।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে তার ব্যয়ভারের সম্পর্ক আছে। বিষয়টি কুদরতে খুদা কমিশন বাস্তবতার আলোকে দেখেছে। তারা মনে করেছে যে, বাংলাদেশে জাতীয় আয়ের অন্ততঃ শতকরা পাঁচ ভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয় হওয়া উচিত আর তার মধ্যে ষাট শতাংশ ব্যয় করা উচিত প্রাথমিক শিক্ষায় (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) জন্য। সে হার পরবর্তী কালে বৃদ্ধির প্রয়োজনের কথাও উপলব্ধি করা হয়েছে। যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার সরকার বহন করবে, অতএব তার জন্য কর আরোপের কথাও শিক্ষা কমিশনের চিন্তার মধ্যে ছিলো।

আমাদের আজকাল জাতীয় আয়ের বড় জোর শতকরা দু'ভাগ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়। বলা হয় যে শিক্ষা খাতে পুরো বাজেট থেকে বারোশত কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির কারণে তার প্রকৃত মূল্য মারাত্মকভাবে কমে গিয়েছে। শিক্ষাখাতে প্রকৃত মূল্যের মাপকে ঠিক রাখার জন্যই চলিত মূল্যে জাতীয় আয়ের একটা সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখার কথা বলা হয়। উপরন্ত শিক্ষার প্রশাসনিক দুর্বলতার জন্য যা ব্যয় করা হয় তার থেকে যথেষ্ট লাভ করা যায় না।

দেশে অর্থনৈতিক বিপ্লবের একান্ত প্রয়োজন। নইলে আমরা লেজুড়ে অর্থনীতি ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়া থেকে মুক্তি পাবো না। মুক্তি পাবার অন্যতম পূর্বশর্ত প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তিকে দৃঢ় ও সার্বজনীন করা। আট বছর ... দেশের সমস্ত ছেলেমে... আমা-